দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 21 JUN 2008

যোগ্য শিক্ষকের অভাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ও পরিবেশ নিম্নগামী হচ্ছে

অবৈধভাবে নিয়োগের কারণে মেধাবীরা এ পেশায় স্থান পায়নি

॥ নিজামুল হক ॥

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা (৪)

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের সকল নিয়ামকের মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য হলেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধিকাংশ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও মেধা নেই। ফলে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। সরকারি এক তথ্য অনুযায়ী দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫১ শতাংশ এবং মাদ্রাসায় ২৯ শতাংশ শিক্ষক রয়েছেন, যারা স্নাতকে তৃতীয় বিভাগধারী। গবেষণা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও মেধা না থাকায় মানসম্মত শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যতই থাকুক না কেন, যদি শিক্ষক ভাল বা উপযুক্ত না হয় তবে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন সম্ভব নয় বলে শিক্ষাবিদরা মত দিয়েছেন। শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) এক জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-প্রাপ্ত বেশিরভাগ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। গভর্নিং কমিটির অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের কারণে যোগ্য ও মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় স্থান পায়নি। ফলে গভর্নিং কমিটি, তৃতীয় এবং দ্বিতীয় বিভাগধারীদের (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

যোগ্য শিক্ষকের অভাবে

(১৬শ পৃঃ পর)

দৌরাত্ম্যে মেধাবীদের সুযোগ হয়নি শিক্ষক হিসাবে চাকরি পাওয়ার।

ব্যানবেইস বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, দেশের ১৭ হাজার ৩৮৩ টি স্কুলের ২ লাখ ৬ হাজার ৫৫৭ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৬৬৮ জন স্নাতক পর্যায়ে প্রথম বিভাগ অধিকারী। এছাড়া বাকি ৫৬ হাজার ২৬৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৮৭ হাজার ১৮৮ জন তৃতীয় বিভাগধারী। ৮ হাজার ৪১০ টি মাদ্রাসার ১ লাখ ২৮ হাজার ৩৮০ জন শিক্ষকের মধ্যে স্নাতকে মাত্র ৩১২ এবং ফাজিলে ৩৯৩ জন প্রথম বিভাগ অধিকারী। এছাড়া ২৪ হাজার ২৩৭ জন দ্বিতীয়-এবং ১৩ হাজার ৩৪৫ জন শিক্ষক তৃতীয় বিভাগধারী। কলেজের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। দেশের ২ হাজার ৭৯৪ টি কলেজের ৭৪ হাজার ২৬৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪১৯ জন প্রথম, ৫ হাজার ৭৮৯ জন দ্বিতীয় এবং ৩ হাজার ২৭৮ জন তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত।

এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫১ দশমিক ৮৩ শতাংশ তৃতীয় বিভাগ, ৩৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ দ্বিতীয় বিভাগ এবং মাত্র ১ শতাংশের নিচে স্নাতকে প্রথম বিভাগ অর্জনকারী শিক্ষক রয়েছেন। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ তৃতীয় বিভাগ, ৩০ শতাংশ দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১ শতাংশের নিচে স্নাতকে প্রথম ডিগ্রীধারী শিক্ষক রয়েছে। কলেজের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ তৃতীয়, ৭৯ শতাংশ দ্বিতীয় এবং মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী রয়েছে। ২০০৬ সালে সরকারিভাবে প্রকাশিত সরকারি এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ, কলেজ স্তরে ৪ এবং মাদ্রাসা স্তরে ৬ শতাংশ। বেশিরভাগ শিক্ষকের শিক্ষাক্ষেত্রের আধুনিক ধ্যান- ধারণা ও পরিবর্তনের সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই। শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। স্কুল ও মাদ্রাসায় মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব রয়েছে ৫৩ ভাগ। বহু শিক্ষক শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারই জানেন না। শতকরা ৮৫ ভাগ ব্যবহার জানলেও ব্যবহার করেন না। শতকরা ৫৪ ভাগ শিক্ষক শিক্ষাদান কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ৯০ ভাগের প্রশিক্ষণ থাকলেও আধুনিক শিক্ষাদান কৌশল তারা ব্যবহার করেন না। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অপ্রতুলতার কারণে ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে পাঠদান করেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য।

এদিকে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের যোগ্যতা ও দক্ষতার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষক একই সঙ্গে একজন শিক্ষক, একজন ব্যবস্থাপক ও একজন নেতা। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকটাই তার ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হলেও অনেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন।

দেশের ১৪ হাজার ৯৪৫ জন প্রধান শিক্ষকের ওপর জরিপ চালিয়ে সরকারি এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে মাত্র ১৯৫ জন স্নাতক (অনার্স) এবং ১২ হাজার ৪৫ জন স্নাতক (পাস) ডিগ্রী অর্জন করেছেন। এ জরিপের তথ্যে দেখা যায়, দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ের, তাও আবার অধিকাংশই তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত। শিক্ষা বিজ্ঞানে ৫৭ শতাংশ প্রধান শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই।

অন্যদিকে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিংয়ের দিকে ঝুঁকছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সুশিক্ষা আন্দোলনের এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, ১২টি পরিবারের শিশু শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত মোট ৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কেবল একজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে না। বাকি সবাই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে। যার শতকরা হার ৯৭ ভাগ।

জানা গেছে, গতবছর এসএসসির সেরা তালিকায় অবস্থান নেয়া মনিপুর স্কুলটির ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থীই প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষকদের মানসিক চাপ থাকার কারণেই শিক্ষার্থীরা কোচিং এবং টিউশনিতে বাধ্য হয়েছে বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানিয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, আমরা স্বেচ্ছায় পড়ি না, পড়তে হয়। এ প্রতিষ্ঠানের আশপাশ ঘিরে রয়েছে ৫০টির অধিক কোচিং সেন্টার। এ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষকের পরিচালিত কোচিং সেন্টারে সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এ কোচিং সেন্টারের সকল শিক্ষার্থী মনিপুর স্কুলের। এছাড়া মনিপুর স্কুলের আশপাশে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টার সমূহের মধ্যে রয়েছে আল ফালাহ, উত্তরণ, ইকরা, এ ওয়ান, আল হিকমাহ, আইকন, পূর্বাশা, গ্রীন, বৃহস্পতি, সৃষ্টি, শতাব্দি পারফেক্ট, উমারাসহ প্রায় পঞ্চাশটি কোচিং সেন্টার।

জানা গেছে, মনিপুর স্কুলের শিক্ষার্থী বাদে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ঐ সব কোচিং সেন্টারে পড়ানো হয় না। মনিপুর স্কুলের ক্লাস শুরু হবার পূর্বে এবং ছুটির পরে এসব কোচিং সেন্টার জমে ওঠে। ২শ' থেকে শুরু করে এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে এক একটি কোচিং সেন্টারে। হিসাব করে দেখা গেছে, মনিপুর স্কুলের ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়ে এ কোচিং সেন্টারগুলোতে। অন্যরা প্রাইভেট টিউশনিতে পড়ে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে। এভাবে প্রতি শিক্ষার্থীর কোচিং বা টিউশনি বাদে গড়ে খরচ হয় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে একজন শিক্ষক গড়ে ২ শতাধিক শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। প্রতি শিক্ষার্থীকে ন্যূন পক্ষে তিনজন শিক্ষকের কাছে টিউশনি পড়তে হয়। এভাবে কোচিং এবং প্রাউভেট টিউশনির ওপরই নির্ভরশীল মনিপুরসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। এভাবে রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশনিতে সময় কাটান। শিক্ষাবিদরা বলছেন, এ কারণে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কিছুই শেখানো হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের স্কুল বিমুখ করা হচ্ছে। স্কুলের লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। অথচ সরকার এ ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিচ্ছে না বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন।